

“And this was only Version One”

দ্য এমআইটি প্রটোকল

“মানুষ যখন নিজের ছায়াকে ভয় পেতে শুরু করে”

(সূচিপত্র)

- প্রস্তাবনা: এমআইটির পাগলটা
- অধ্যায় ১: মানুষ-ক্যালকুলেটর
- অধ্যায় ২: ঘুমহীন মানুষের চোখ
- অধ্যায় ৩: অন্ধকারের জন্ম
- অধ্যায় ৪: অদৃশ্য হয়ে যাওয়া
- অধ্যায় ৫: বোস্টনের রাস্তায়
- অধ্যায় ৬: এমআইটি প্রটোকল
- অধ্যায় ৭: পাগলটা আসলে কী বানাচ্ছিল?
- অধ্যায় ৮: কাউন্টডাউন
- অধ্যায় ৯: পৃথিবীর সবচেয়ে নীরব বিপর্যয়
- অধ্যায় ১০: অন্তিম দৃশ্য
- অধ্যায় ১১: দানব নাকি নায়ক?
- অধ্যায় ১২: শেষ ভিডিও
- শেষ দৃশ্য

দ্য এমআইটি প্রটোকল

“মানুষ যখন নিজের ছায়াকে ভয় পেতে শুরু করে”

প্রস্তাবনা: “MIT-এর পাগলটা”

বোস্টনের মানুষ তাকে একনামে চিনত।

“The MIT Madman.”

প্রতিবছর শীত নামলেই এমআইটি ক্যাম্পাসের সামনে দেখা যেত তাকে।

জরাজীর্ণ কালো কোট।

বগলের নিচে পুরোনো একটা ফাইল।

চোখে অদ্ভুত শূন্যতা।

বরফের মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকত সে।

কোনো প্রফেসর বা ছাত্র বের হলেই দৌড়ে গিয়ে কাঁপা গলায় বলত—

“স্যার... প্লিজ... আমার থিসিসটা একবার দেখুন...”

আমি ভুল ছিলাম না...”

প্রথমদিকে মানুষ সাহায্য করতে চেয়েছিল।

কেউ খাবার দিয়েছে।

কেউ পুলিশ ডেকেছে।

কেউ তাকে মানসিক হাসপাতালে পাঠাতে চেয়েছে।

কিন্তু ধীরে ধীরে সবাই বুঝে গেল—

ছেলেটা আর স্বাভাবিক নেই।

মাঝরাতে তাকে দেখা যেত এমআইটির দেয়ালে চক দিয়ে জটিল সমীকরণ লিখতে।

কখনো রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে অদৃশ্য কারো সাথে তর্ক করতে।

TikTok তাকে ভাইরাল বানিয়ে দিল।

YouTube তাকে নিয়ে ডকুমেন্টারি বানাতে লাগল।

কেউ বলল সে ব্যর্থ জিনিয়াস।

কেউ বলল সাবেক CIA হ্যাকার।

কেউ বলল সে স্রেফ উন্মাদ।

কিন্তু বোস্টনের কেউ জানত না—

প্রতি রাতে MIT-এর উল্টো পাশের অন্ধকার একটা স্যাঁতসেঁতে অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে সেই “পাগল”

ছেলেটাই পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ংকর ডিজিটাল অস্ত্র তৈরি করছিল।

অধ্যায় ১: মানুষ-ক্যালকুলেটর

স্থান: বাংলাদেশ।

ঢাকা।

বুয়েটের শহীদ স্মৃতি হল।
সময়: রাত ৩টা।
পুরো হল ঘুমিয়ে।
শুধু একটা রুমে আলো জ্বলছে।
সেখানে বসে আছে রাজিন।
তার সামনে শত শত সমীকরণ।

রিসার্চ পেপার।

কফির খালি কাপ।
তিনদিন ধরে সে ঘুমায়নি।
বুয়েটে সবাই তাকে ডাকত—

“মানুষ-ক্যালকুলেটর।”
কারণ রাজিন শুধু অঙ্ক করত না।
সে সংখ্যার ভেতরের লুকানো প্যাটার্ন দেখতে পেত।
কিন্তু তার ভেতরে একটা ভয়ংকর জিনিস ছিল—
সে হারতে জানত না।
তার কাছে দ্বিতীয় হওয়া মানেই মৃত্যু।
তার রুমের দেয়ালে বড় করে লেখা ছিল—

“MIT OR NOTHING.”
রাজিন বিশ্বাস করত—
MIT তাকে নিতেই বাধ্য।
কারণ সে “স্পেশাল”।
কিন্তু বাস্তব পৃথিবী কখনো কারও অহংকারের কাছে মাথা নত করে না।
এক সকালে তার ইনবক্সে একটা ইমেইল এলো।

“We regret to inform you...”
মাত্র তিন লাইনের সেই ইমেইলটা রাজিনের ভেতরের সবকিছু ভেঙে দিল।
সে স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে রইল।
কোনো শব্দ নেই।
কিছুক্ষণ পর সে খুব আশ্তে বলল—

“না... এটা ভুল...”
তারপর আবার পড়ল।
আবার।
আবার।
রাত তিনটার দিকে তার রুমমেট ঘুম ভেঙে দেখল—

রাজিন ল্যাপটপের সামনে বসে হাসছে।
ভয়ংকর একটা হাসি।
যার মধ্যে কান্না ছিল।

অপমান ছিল।

আর জন্ম নিচ্ছিল উন্মাদনা।
অধ্যায় ২: ঘুমহীন মানুষের চোখ
এরপর রাজিন বদলে যেতে শুরু করল।
প্রথম একমাস কেউ কিছু বুঝতে পারেনি।
সে ক্লাসে যেত।

বন্ধুদের সাথে হাসত।

কিন্তু রাত নামলেই অন্য মানুষ হয়ে যেত।
সে ঘুমানো বন্ধ করে দিল।
রাতে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকত ঘণ্টার পর ঘণ্টা।
এক রাতে হঠাৎ সে আয়নার দিকে গ্লাস ছুঁড়ে মারল।
কাচ ভেঙে মেঝেতে ছড়িয়ে গেল।
আর ভাঙা কাচের প্রতিটা টুকরোয় সে নিজের আলাদা আলাদা মুখ দেখতে পেল।
একটা মুখ কাঁদছে।

একটা মুখ হাসছে।

একটা মুখ ফিসফিস করে বলছে—
“ওরা তোকে রিজেক্ট করেনি, রাজিন...”

ওরা তোকে মুছে ফেলেছে।”
সেই রাতের পর রাজিন আর কাউকে মানুষ হিসেবে দেখা বন্ধ করে দিল।
অধ্যায় ৩: অন্ধকারের জন্ম
ধীরে ধীরে রাজিন ইন্টারনেটের এমন জায়গায় ঢুকতে শুরু করল, যেখানে সাধারণ মানুষ যায় না।
ডার্ক ওয়েবের মৃত ফোরাম।

হ্যাক হওয়া সরকারি আর্কাইভ।

পুরোনো সাইবার ওয়ারফেয়ারের নথি।
সে দিনের পর দিন একটা কথাই ভাবত—

“যদি পৃথিবী মানুষকে শুধু সফলতা দিয়ে বিচার করে...”

তাহলে পৃথিবীর সিস্টেমটাই অসুস্থ।”

তার মাথার ভেতরে তখন বাস্তব আর কল্পনার দেয়াল ভেঙে গেছে।
সে বিশ্বাস করতে শুরু করল—
প্রতিটা ক্যামেরা তাকে দেখছে।

প্রতিটা ওয়াইফাই নেটওয়ার্ক তার চিন্তা শুনছে।

প্রতিটা অ্যালগরিদম তাকে নিয়ে হাসছে।
এক রাতে তার রুমমেট দরজা ভেঙে ঢুকে দেখল—
পুরো দেয়ালজুড়ে লেখা—

“THE INTERNET IS NOT A NETWORK.

IT IS A GOD.”

অধ্যায় ৪: অদৃশ্য হয়ে যাওয়া
তারপর এক সকালে রাজিন উধাও হয়ে গেল।
ফোন বন্ধ।

ফেসবুক ডিলিট।

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খালি।
তার রুমে শুধু পাওয়া গেল অর্ধেক পুড়ে যাওয়া একটা ডায়েরি।
শেষ পাতায় লেখা—

“ওরা যদি আমাকে পৃথিবী থেকে মুছে দিতে চায়...

তাহলে আমিও ওদের সিস্টেম মুছে দেব।”
অধ্যায় ৫: বোস্টনের রাস্তায়
দুই বছর পর প্রথম দেখা মিলল রাজিনের।
বোস্টনের রাস্তায়।
সে তখন আর আগের রাজিন নেই।
চোখ লাল।

মুখে বড় দাড়ি।

গায়ে নোংরা কালো কোটা।
সে রাস্তার মানুষদের থামিয়ে বলত—

“তোমার ফোন তোমার চেয়ে তোমাকে বেশি চেনে।”
কখনো Starbucks-এর ন্যাপকিনে কোড লিখত।
কখনো MIT-এর সামনে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদত—

“আমি ভুল ছিলাম না স্যার...”

মানুষ তাকে ভয় পেত।
কারণ তার চোখে এমন কিছু ছিল যা সুস্থ মানুষের মধ্যে থাকে না।
কিন্তু কেউ জানত না—
রাজিন পাগল হয়নি শুধু।
সে একটা “চিন্তা” তৈরি করছিল।
একটা ডিজিটাল মহামারি।
অধ্যায় ৬: MIT Protocol
বোস্টনের অন্ধকার একটা বেসমেন্টে বসে রাজিন তৈরি করল—

“MIT Protocol”
এটা ভাইরাস ছিল না।
ম্যালওয়্যারও না।
এটা ছিল এমন একটা সিস্টেম—
যা পৃথিবীর ডিজিটাল বিশ্বাসকে ধ্বংস করতে পারে।
ব্যংক বুঝবে না কোন অ্যাকাউন্ট আসল।

AI নিজের ডেটাকে বিশ্বাস করবে না।

স্যাটেলাইট বুঝবে না কোন সিগন্যাল সত্যি।
কারণ রাজিন বুঝে গিয়েছিল—

“মানুষের সভ্যতা সত্যের ওপর দাঁড়িয়ে নেই।

দাঁড়িয়ে আছে বিশ্বাস নামের একটা ভঙ্গুর মিথ্যার ওপর।”
অধ্যায় ৭: পাগলটা আসলে কী বানাচ্ছিল?
রাজিন মাঝরাতে MIT-এর দেয়ালে সমীকরণ লিখত।
লোকজন ভিডিও করত।

হাসত।

TikTok-এ মিম বানাত।
কিন্তু কেউ খেয়াল করেনি—
সে যখন আকাশের দিকে তাকিয়ে কথা বলত...
তখন সে নিজের সাথে কথা বলছিল না।
সে কথা বলছিল তার তৈরি করা সিস্টেমের সাথে।
কারণ MIT Protocol ধীরে ধীরে নিজে চিন্তা করতে শিখে ফেলেছিল।
অধ্যায় ৮: কাউন্টডাউন
সেদিন বোস্টনে ভয়ংকর তুষারপাত হচ্ছিল।
রাজিন অন্ধকার রুমে বসে ছিল।
মনিটরের আলোয় তার চোখ মৃত মানুষের মতো লাগছিল।
স্ক্রিনে একটা মাত্র লাইন—

“ARE YOU SURE?”

তার আঙুল কাঁপছিল।

কারণ সে জানত—

Enter চাপার পর পৃথিবী বদলে যাবে।

হঠাৎ সে কাঁদতে শুরু করল।

নিঃশব্দ কান্না।

তারপর খুব আন্তে বলল—

“আমি শুধু চেয়েছিলাম...

ওরা আমাকে একবার বিশ্বাস করুক...”

তারপর সে Enter চাপল।

অধ্যায় ৯: পৃথিবীর সবচেয়ে নীরব বিপর্যয়

পরের ১৭ সেকেন্ডে পৃথিবী বদলে গেল।

কেউ বিস্ফোরণের শব্দ শোনেনি।

কিন্তু—

ব্যাংকের ডেটা নিজেদের মুছতে শুরু করল।

এয়ারপোর্টের রাডার ভূয়া বিমান দেখতে লাগল।

হাসপাতালের AI রোগীদের মৃত ঘোষণা করতে লাগল।

স্টক মার্কেটের সব সংখ্যা শূন্য হয়ে গেল।

আর MIT-এর প্রতিটা স্ক্রিনে ভেসে উঠল—

“YOU TAUGHT MACHINES TO THINK.

I TAUGHT THEM TO DOUBT.”

অধ্যায় ১০: অন্তিম দৃশ্য

FBI যখন রাজিনের রুমে ঢুকল—

ঘরটা ফাঁকা।

জানালায় বাইরে তুষার পড়ছে।

টেবিলের ওপর সেই পুরোনো কালো কোট।

দেয়ালে রক্ত দিয়ে লেখা—

“A BROKEN MIND

CAN SEE

WHAT NORMAL PEOPLE IGNORE.”

ঘরের চারপাশ ভর্তি সমীকরণ।

একজন MIT প্রফেসর দেয়ালের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বললেন—

“এগুলো পাগলের লেখা না...

এগুলো এমন একজন মানুষের কাজ...

যে আমাদের সময়ের চেয়ে বিশ বছর এগিয়ে ছিল।”

সেই মুহূর্তে সবাই বুঝল—

রাজিন শুধু প্রতিশোধ নেয়নি।

সে পৃথিবীকে একটা সতর্কবার্তা দিয়ে গেছে।

অধ্যায় ১১: দানব নাকি নায়ক?

ঘটনার পর পৃথিবী বদলে গেল।

মানুষ প্রথমবার বুঝল—

তাদের জীবন আসলে অ্যালগরিদমের হাতে বন্দী।

বিশ্বজুড়ে আন্দোলন শুরু হলো।

মানুষ রাস্তায় নেমে চিৎকার করতে লাগল—

“WE ARE NOT DATA.”

সরকারগুলো বাধ্য হলো গোপন নজরদারি কমাতে।

বড় বড় টেক কোম্পানি ক্ষমা চাইতে বাধ্য হলো।

আর ধীরে ধীরে মানুষ “MIT Madman”-কে ভয় পাওয়া বন্ধ করল।

বরং অনেকে তাকে দেখতে শুরু করল—

একটা ভাঙা নায়ক হিসেবে।

যে নিজের জীবন শেষ করে হলেও পৃথিবীকে জাগিয়ে দিয়েছে।

অধ্যায় ১২: শেষ ভিডিও

ঘটনার এক মাস পর।

হঠাৎ পৃথিবীর প্রায় সব নিউজ চ্যানেলের সম্প্রচার বন্ধ হয়ে গেল।

স্ক্রিন কালো।

তারপর ধীরে ধীরে একটা ভিডিও ভেসে উঠল।

অন্ধকার রুম।

ক্যামেরার সামনে বসে রাজিন।

চোখ ক্লান্ত।

কিন্তু এবার সেখানে উন্মাদনা নেই।

শুধু শান্তি।

সে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে বলল—

“সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার কী জানো?”

“মানুষ স্বাধীনতা হারানোর আগ পর্যন্ত বুঝতেই পারে না...

যে সে বন্দী ছিল।”

তার চোখে পানি চিকচিক করছিল।

“আমি পৃথিবী ধ্বংস করতে চাইনি...”

“আমি শুধু চেয়েছিলাম মানুষ একবার প্রশ্ন করুক।”

ভিডিওটা হঠাৎ গ্লিচ করল।

তারপর সে খুব আশ্তে বলল—

“And this...”

was only Version One.”

ভিডিও কেটে গেল।

পুরো পৃথিবী স্তব্ধ।

শেষ দৃশ্য

দুই বছর পর।

সুইজারল্যান্ডের পাহাড়ি ছোট্ট শহর।

বরফ পড়ছে।

একটা পুরোনো লাইব্রেরির কোণে বসে একজন লোক বই পড়ছে।

কালো কোট।

চোখে চশমা।

মুখে দাড়ি।

লাইব্রেরিয়ান এসে বলল—

“Sir, we’re closing.”

লোকটা ধীরে মাথা তুলল।

এক সেকেন্ডের জন্য তার চোখে ঠান্ডা নীল আলো বলসে উঠল।

সে বইটা বন্ধ করল।

বইয়ের ভেতর থেকে একটা কাগজ মেঝেতে পড়ে গেল।

লাইব্রেরিয়ান সেটা তুলে নিল।

কাগজে লেখা—

“MIT Protocol 2.0

Initializing...”

লাইব্রেরিয়ান মাথা তুলে তাকাল।

কিন্তু লোকটা তখন বরফের মধ্যে হেঁটে দূরে চলে যাচ্ছে।

ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে তার ছায়া।

আর পৃথিবীর কোথাও—

কোনো অদৃশ্য সার্ভারের লাইট

আবার জ্বলে উঠল....

“And this was only Version One”

-end